ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 460- 465
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.229

প্রসঙ্গ ধর্ম: যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংলাপের আলোকে একটি সমীক্ষা

পার্থসারথি অধিকারী, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.11.2025; Accepted: 27.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The great epic *Mahabharata* contains many gems of wisdom, and among them the *Yaksha Yudhiṣṭhira Prashnattorparva* or dialogue is important one. In the *Vana Parva*, the dialogue between *Yaksha*, the God of *Dharma*, and his son *Yudhiṣṭhira* unfolds as a philosophical inquiry into the nature of righteous living and the ultimate purpose of human existence. The Yaksha's numerous questions, broadly aligned with the domains of *Dharma* and *Moksha*, serve as a gateway to understand both ethical conduct and the spiritual destiny of human life. This article will examine the multidimensional nature of *dharma* as reflected in this dialogue.

Keywords: Mahabharata, Yaksha, Yudhiṣṭhira, Yaksha Prashna, Dharma, Moksha

ধর্ম মানবজীবনের এক অন্যতম মৌলিক ও জটিল ধারণা। প্রাচীনকাল থেকেই মানবসভ্যতা ধর্মের অর্থ, উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ নিয়ে চিন্তিত। বেদ, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, মনুস্মৃতি প্রভৃতিতে ধর্মকে কখনো নৈতিক শৃঙ্খলা, কখনো সামাজিক কর্তব্য, আবার কখনো আত্মোপলব্ধির পথ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু এত বহুমাত্রিক ব্যাখ্যার মাঝেও প্রশ্ন থেকে যায়— ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কী? ধর্ম কি কেবল আচারের বিধি, নাকি মানবজীবনের নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষের একটি আন্তরিক প্রয়াস? এই অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতেই যক্ষ-যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর পর্বকে কেন্দ্র করে এই প্রবন্ধে প্রসঙ্গ ধর্ম আলোচিত হবে।

'ধর্ম' শব্দটির নানা ব্যুৎপত্তিগত ও প্রয়োগগত অর্থ রয়েছে; লোকধারক, শ্রেয়, শুভদৃষ্ট, পূণ্য, চতুর্বর্গের এক, আচার, আনুষ্ঠানিকতা, শাস্ত্রবিধি, অনুশাসন, সম্প্রদায় বিশেষের আচার, ন্যায়, বিচার, নীতি, স্বভাব, গুণ, লক্ষণ, উপমা, অভিধেয়বস্তু, যজ্ঞাদি, ঈশ্বর, আত্মা, যম, এমনকি যুধিষ্ঠির প্রমুখ অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এই বহুবিধ অর্থবাহী 'ধর্ম' শব্দটি ভারতীয় জীবনদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। এমনকি অভারতীয় ঐতিহ্যেও এর প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। এই শব্দের মধ্য দিয়েই ভারতীয়রা যুগ যুগ ধরে তাদের লক্ষ্য, কামনা, আত্মশুদ্ধি, নৈতিক চেতনা এবং বোধকে পরিচালিত করেছে। ব্যক্তি যখন ধর্মের মৌলিকতাকে হারায়, তখন সমাজে কুসংস্কার, কুপ্রথা এবং কৃত্রিম আচরণবাদের বিস্তার ঘটে। এই বিচ্যুতি যখন চরমে পৌঁছায়, তখনই ইতিহাস দেখেছে— মহামানবেরা আবির্ভূত হয়েছেন। তারা নতুন রূপে ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আচার-বিচারের খোলস ভেঙে ধর্মের মূল আত্মাকে প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, "মানুষই ব্রহ্ম"— এই গভীর সত্যই ধর্মের মূলে নিহিত।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সংস্কৃত ভাষায় 'ধর্ম' শব্দটি অনেক গভীর ও বিস্তৃত অর্থ বহন করে। 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে মন্ প্রত্যয় যোগে ধর্ম শব্দ নিষ্পন্ন, যার মূল অর্থ হল— ধারণ করা, আশ্রয় দেওয়া বা পালন করা। এই ধারণক্ষমতাই ধর্মের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। ধর্মের বিভিন্ন অর্থের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থই প্রকাশ পেয়েছে।

অতএব, ধর্ম একটি সর্বজনীন ধারণা, যা জড় ও চেতন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক, প্রাকৃতিক ও নৈতিক— সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এটাই ভারতীয় দর্শনের ধর্মবোধের মৌলিকতা, যা পাশ্চাত্য 'religion' ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ধর্মের ক্ষেত্রে একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হল— ধর্মের ক্ষেত্রে দুটি উপাদান থাকে, এই দুটি উপাদানের মধ্যে একটা সম্বন্ধ বর্তমান। এই সম্বন্ধ অযুতসিদ্ধ।

পাশ্চাত্য সমাজে 'religion' শব্দটির অর্থ একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত বিশ্বাস বা উপাসনা-পদ্ধতি, যেখানে আধ্যাত্মিক অনুশাসন প্রধান, কিন্তু তা দর্শন বা বাস্তব আচরণধর্মী কর্তব্যের দিক থেকে সীমিত। 'ধর্ম' শব্দটিকে যখন ইংরেজির 'religion' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করি, তখনই মূলত মূল ভাবের অপচয় ঘটে এবং একটি সংকীর্ণতা জন্ম নেয়। এর ফলেই আমাদের মধ্যে, বিশেষত শিক্ষিত সমাজে, 'ধর্ম' শব্দকে 'ধর্ম নাম' অর্থাৎ হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি সম্প্রদায়-নির্ভর এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়ের সাথে গুলিয়ে ফেলার প্রবণতা জন্ম নেয়।

ভারতবর্ষে সর্বাধিক প্রচলিত ও প্রাচীন ধর্মীয় ধারা হল বৈদিক ধর্ম। বৈদিক ধর্মে 'ধর্মের' পরিভাষা হল, বেদ প্রতিপাদিত অনুষ্ঠান বিধিপূর্বক পালন করা। *"বেদপ্রতিপাদ্যঃ প্রয়োজনবদর্থো ধর্ম ইতি"* [১] এটি রুঢ়বাদী ব্যাখ্যা। অর্থাৎ সেই ব্যাখ্যা যা প্রাচীনকাল থেকে ধর্মীয় পরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও গৃহীত হয়েছে। বেদে মানুষের ধ্যেয়ের বিষয় নিশ্চিত করে দেওয়া হয়েছে। তাই ধ্যেয়ের প্রাপ্তির জন্য ধর্মের এইরূপ পরিভাষা। যার দ্বারা অভ্যুদয় ও নি:শ্রেয়স এর প্রাপ্তি হয় তাই হল ধর্ম। *"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"* [২] যা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভের হেতু তাই ধর্ম। অভ্যুদয়ের অর্থ হল লৌকিক উন্নতি, তথা নি:শ্রেয়স হলো পারমার্থিক উন্নতি। ধর্মের এরূপ ব্যাখ্যা রূঢ়বাদী ব্যাখ্যার মধ্যে অন্তর্গত। কারণ, অভ্যুদয় ও নি:শ্রেয়স এর প্রাপ্তিই হল বৈদিক অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। যা বেদে নির্দেশিত, যা ঋষিগণ উপলব্ধি করেছেন, যা তর্কসম্মত ও শাস্ত্রসম্মত, তা-ই ধর্ম।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে, যাগাদি বৈদিক কৃত্যসমূহই ধর্ম, এবং যারা এই ধর্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত, তারাই প্রকৃত অর্থে ধার্মিক। যাগাদির অনুষ্ঠান শুভ সংস্কার উৎপন্ন করে, আর সেই সংস্কার শুভফল প্রদান করে।

"বিহিতক্রিয়াসাধ্যঃ ধর্ম্মঃ পুংসো গুণোমতঃ।
প্রতিসিদ্ধক্রিয়াসাধ্যঃ সগুনোঽধর্ম্ম উচ্যতে।।
ধর্ম্মশ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োঽভ্যুদ্যসাধং।" [৩]

অর্থাৎ,

যে গুণ বিহিত ক্রিয়া দ্বারা সাধিত হয়, তাকেই ধর্ম বলা হয়। আর যে গুণ প্রতিষিদ্ধ ক্রিয়ার দ্বারা সাধিত হয়, তা অধর্ম। ধর্ম হল সেই যা শ্রেয়স্কর, অর্থাৎ যা অভ্যুদয় তথা পারমার্থিক ও লৌকিক মঙ্গলের উপায়।

উক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ধর্ম শব্দটি সেই সকল ক্রিয়াকে নির্দেশ করে, যা শাস্ত্রে বিহিত। শাস্ত্রে যেসব কার্যের বিধান আছে— যেমন যাগ, হোম, দান, তপস্যা ইত্যাদি— সেগুলির অনুশীলন করলেই ধর্মের সাধন হয়। আর যেসব কার্য শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বা প্রতিষেধিত— যেমন হিংসা, চুরি, মিথ্যাচার ইত্যাদি— তাদের অনুশীলন করলে অধর্ম সাধিত হয়।

তবে এই পর্যায়ে একটি আপাত-দৃষ্টিতে বিতর্কযোগ্য বিষয় লক্ষ্য করা যায়। অনেকের মতে, যাগাদি কর্মে পশুহিংসা থাকে, ফলে তা অধর্ম। কিন্তু মীমাংসা দর্শন, স্মৃতি ও বৈদিক শাস্ত্রসমূহে বিশদভাবে মীমাংসা করা হয়েছে যে, এখানে হিংসা উদ্দেশ্য নয়, উপায়। যেহেতু যাগাদি কর্ম বেদ দ্বারা বিহিত, তাই তা ধর্ম। বরং উক্ত বিহিত কর্ম না করাটাই অধর্ম।

বৈদিক পরম্পরায় 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ বহুবিধ হলেও, সামাজিক ও আচারগত ক্ষেত্রে তা এক বিশেষ নীতি বা বিধানের প্রতীক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— প্রত্যেক বর্ণের ধর্ম ভিন্ন; তেমনি প্রত্যেক আশ্রমেরও ধর্ম স্বতন্ত্র। যে কর্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে অধর্ম, সেই একই কর্ম ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পরম ধর্ম হতে পারে। অর্থাৎ, ধর্ম সার্বজনীন একক নিয়ম নয়—বরং ব্যক্তি, কাল, স্থান ও পরিস্থিতি অনুসারে তার রূপ পরিবর্তিত হয়। প্রত্যেক বর্ণাশ্রমের জন্য নির্দিষ্ট কিছু আচরণ

[১] অর্থসংগ্রহ— ১/২
[২] বৈশেষিকসূত্র— ১/১/২
[৩] মীমাংসাসুত্র—১/২

ও বিধি-নিয়ম আছে; সেই সকল বিধির যথাযথ পালনের নামই ধর্ম। আর সেই বিধি লঙ্ঘনই অধর্ম। ধর্মাচরণের ফলস্বরূপ সুখ এবং অধর্মাচরণের ফলস্বরূপ দুঃখের উৎপত্তি ঘটে।

এখন প্রশ্ন হল ধর্ম কি; শাস্ত্রের পৃষ্ঠায় লেখা কিছু বিধি? কোনো দেবতার পাদপদ্মে অর্ঘ্য নিবেদন? না কি আত্মার গভীর থেকে জেগে ওঠা আলো, যা অন্ধকারেও ন্যায়ের পথ চিনে নেয়? যুধিষ্ঠির যখন যক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে, তখন তার হাতে কোনো ধর্মশাস্ত্র ছিল না, ছিল না পুরোহিতের বাণী কিংবা কোনো দেববাণী। ছিল কেবল তাঁর অভিজ্ঞতা, বিবেক আর মনুষ্যত্ব। তিনি ধর্মকে খুঁজেছেন মানুষের ভিতর— বিরাট কোনো তত্ত্বে নয়, হৃদয়ের সংবেদনশীলতায়। তিনি বলেন, 'ধর্ম হল অন্তর্জাত সত্যবোধ; যা দুঃখের মাঝেও করুণা জাগায়, যা সংকটেও ন্যায়ের পথ বেছে নেয়।'

এখন দেখবো যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম সংক্রান্ত যে প্রশ্নগুলি করেছিলেন এবং যুধিষ্ঠির যে উত্তর দিয়েছিলেন সেই ধর্ম কেমন। আসলে যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংলাপ মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত আরণ্যক উপপর্বের অংশ। এই সংলাপ কেবল পৌরাণিক বা কাহিনি নির্ভর নয়, বরং এটি মানবজীবনের মূল্যবোধ, ধর্মবোধ এবং মানবতাবাদের এক প্রতীকী রূপ। যুধিষ্ঠিরের উত্তরের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে সেই মানবিক বোধ, যেখানে ধর্ম কেবল নিয়ম নয়, বরং মানবতার সচেতন সত্তা।

যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে বহু প্রশ্ন করেছেন, তার মধ্যে একটি হল, *কিং "স্বিদ্ধর্ম্মং সনাতনম্"* [৪] অর্থাৎ, শাশ্বত স্বধর্ম কি? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, "*সনাতনঃ সত্যধর্ম্মো"* [৫] অর্থাৎ, সনাতন ধর্ম হলো সত্য। এরকম উত্তর দেওয়ার কারণ হল 'সত্য' স্থান, কাল, সমাজ, সংস্কৃতি ভেদে অপরিবর্তনীয়। এই শাশ্বত ধর্ম সম্প্রদায়ভিত্তিক কোন পরিচয় বহন করে না; জীবনের যাপনকে একটা মাত্রা দেয়। যে মাত্রা মুক্তির পথ প্রশস্ত করে। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা যায়, মনুসংহিতায় ধর্মের যে দশটি লক্ষণ উল্লেখ আছে, তার মধ্যে সত্য অন্যতম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার জৈন বা বৌদ্ধ দর্শনের পঞ্চব্রত— অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ— এর মধ্যে সত্য অন্যতম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সত্য কেবল মৌখিক সত্য নয়; কায়, মন ও বাক্যে সত্য।

এটি সেই চিরন্তন সত্য— যাকে উপনিষদে ব্রহ্ম, আত্মা, ঋত, সত্য বা সর্বব্যাপী চৈতন্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। উপনিষদে বলা হয়েছে, *"সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম"* [৬]— ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত।

যক্ষের আর একটি প্রশ্ন হল, "*কিং স্বিদেকপদং ধর্ম্ম্যং"* [৭] অর্থাৎ, ধর্মকে একটিমাত্র শব্দে প্রকাশ করলে, তা কী হবে? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, "*দাক্ষ্যমেকপদং ধর্ম্ম্যং"* [৮] অর্থাৎ ধর্মকে একটিমাত্র শব্দে প্রকাশ করলে, তা হবে দক্ষতা। এখানে দক্ষতা বলতে কর্মক্ষমতা এবং নৈতিকতা উভয়ই। ধর্মের জন্য কর্মক্ষমতাকে নৈতিকভাবে পরিচালিত করা। নীতিসম্মত কর্মক্ষমতাই হল ধর্ম।

শাস্ত্রের দৃষ্টিতে ধর্ম কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়; ধর্ম তখনই বাস্তবায়িত হয়, যখন মানুষ তার দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করতে সক্ষম হয়। তাই সত্য, অহিংসা, দয়া, ন্যায়— এসব গুণ যতই সুন্দর হোক, যদি জীবনে সেগুলোকে যথার্থভাবে রূপায়ণ করার সামর্থ্য না থাকে, তবে ধর্ম অপূর্ণ থেকে যায়। এই কারণে দক্ষতাকে ধর্মের প্রধান ভিত্তি বলে ধরা হয়েছে। দক্ষতাই ধর্মকে জীবিত করে রাখে। শুধু নীতি জানা বা আদর্শ মানলেই ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না; সেই আদর্শকে কর্মে পরিণত করার যোগ্যতাই ধর্মের প্রকৃত প্রাণ। এই উপলব্ধি মানুষকে বাস্তবজীবনে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে দক্ষতার সঙ্গে চলতে শিক্ষা দেয়।

যক্ষের আর একটি প্রশ্ন হল, "*কশ্চ ধর্ম্মঃ পরো লোকে"* [৯] অর্থাৎ, বিশ্বে শ্রেষ্ঠ ধর্ম কি? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, "*আনৃশংস্য পরো ধর্ম্ম"* [১০] অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ ধর্ম হলো দয়া, করুণা এবং অহিংসা। যুধিষ্ঠির এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে,

---

[৪] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্বে, ২৬৭/৫৯, পৃষ্ঠা-২৫৬৫।

[৫] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্বে, ২৬৭/৬০, পৃষ্ঠা-২৫৬৫।

[৬] তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ব্রহ্মানন্দবল্লী— ২.১.১

[৭] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্বে, ২৬৭/৬৩, পৃষ্ঠা-২৫৬৬।

[৮] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্বে, ২৬৭/৬৪, পৃষ্ঠা-২৫৬৬।

[৯] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৬৯, পৃষ্ঠা-২৫৬৮।

[১০] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৭০, পৃষ্ঠা-২৫৬৮।

সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখার সবচেয়ে কার্যকর নীতি হল দয়া, করুণা এবং অহিংসা। এটা মনে করা হয় যে, যে রাজা দয়া জানে না, সে রাজা ন্যায় করতে পারে না। আবার যে ব্যক্তি করুণা জানে না, সে ধর্ম পালন করতে পারে না। আর যে জীবন অন্যকে কষ্ট দেয়, তা কখনো পূণ্যময় হয় না। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা যায়, হিতোপদেশে যে *"আত্মবৎ সর্বভূতেষু"*[১১] — অর্থাৎ সব জীবকে নিজের মতো করে দেখা— যে উচ্চ আদর্শের কথা বলা হয়েছে, আনৃশংস্য তারই ব্যবহারিক রূপ।

যুধিষ্ঠিরের এই উত্তর তাই কেবল নৈতিক নয়; এটি একটি গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। কারণ, ধর্মের মূল উদ্দেশ্যই হলো চিত্তকে বিশুদ্ধ করা, অহংকে দূর করা, এবং মানবসত্তাকে তার নিজস্ব উজ্জ্বল, শান্ত, চৈতন্যময় রূপে প্রকাশ করা। যদি ধর্ম মনকে কঠোর করে তোলে, যদি তা বিভেদ সৃষ্টি করে, যদি তা রাগ বা হিংসা জন্মায়—তবে সেই ধর্ম ধর্ম নয়, বরং আবরণমাত্র।

আবার যক্ষের আর এক প্রশ্ন হল, *"কশ্চ ধর্ম্মঃ সদাফলঃ"* [১২] অর্থাৎ, কি সেই ধর্ম যা সর্বদা ফল দেয়? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, *"ত্রয়ীধর্ম্মঃ সদাফলঃ"*[১৩] অর্থাৎ, বেদত্রয় দ্বারা নির্ধারিত ধর্ম সর্বদাই ফলপ্রদ। ত্রয়ী বলতে বোঝানো হয়েছে তিনটি বেদ (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, এবং সামবেদ)। যুধিষ্ঠির এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে, বেদত্রয়ের দ্বারা প্রণীত ধর্ম সর্বদা সুফল দেয়। এই ধর্মে বিধৃত রয়েছে সৎপথে চলার নীতি, যা মানুষকে মঙ্গলময় জীবনের পথে পরিচালিত করে। বেদত্রয় মানুষকে নৈতিকতা, পরোপকার, সত্য এবং আত্ম-সংযমের শিক্ষা দেয়, যা সর্বদা ফলপ্রসূ। এই ত্রয়ী বেদ প্রসঙ্গে যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। যেমন, *"কিমেকং যজ্ঞিয়ং সাম"*[১৪] অর্থাৎ, সামবেদে যজ্ঞের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান কি? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, *"প্রাণো বৈ যজ্ঞিয়ং সাম"*[১৫] অর্থাৎ, যজ্ঞের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হল প্রাণ। উপনিষদে উক্ত হয়েছে 'ঋকবেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। ঋকবেদ শব্দ স্বরূপ, যজুর্বেদ মন স্বরূপ, সামবেদ প্রাণ স্বরূপ। অর্থাৎ, ঋক্‌বেদের উচ্চারণে ভাষার প্রকাশ, যজুর্বেদের যজ্ঞে মনের নিয়োগ এবং সামবেদের সুরে প্রাণের স্পন্দন— এই ত্রিমুখী ঐক্যেই বেদের সামগ্রিক সত্য প্রকাশিত হয়। যুধিষ্ঠির যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হল— যজ্ঞ কেবল দেহগত নয়, এটি প্রাণ, মন ও শব্দের একত্র সাধনা। প্রাণ থেকে শক্তি, মন থেকে সংকল্প, এবং ঋগ্বেদ থেকে দিকনির্দেশ— এই তিনে মিলেই যজ্ঞ পূর্ণ হয়। যখন মানুষ কেবল নিজের জন্য নয়, অন্যের কল্যাণের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করে, যখন কোনো কাজ শুধুই অর্জনের জন্য নয়, সত্য ও ন্যায়ের আদর্শে উৎসর্গিত হয়, তখনই সেটি প্রকৃত যজ্ঞ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, যজ্ঞ এখানে নৈতিক শক্তির এক মানবতাবাদী রূপান্তর।

এইভাবে বহু জটিল প্রশ্নের উদ্ভব ঘটেছে এই যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংলাপে। এই ক্ষুদ্র পরিসরে যক্ষের সকল প্রশ্ন এবং যুধিষ্ঠিরের উত্তর তুলে ধরা অসম্ভব। তবে, যক্ষের সন্তুষ্টি বাক্য এবং বর প্রদান অংশ এখানে তুলে না ধরলেই নয়। যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়ার পর যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, "*তস্মাত্ত্বমেকং ভ্রাতৃণাং যমিচ্ছসি স জীবতু।।*"[১৬] অর্থাৎ "তোমার ভ্রাতাদের মধ্যে তুমি একজনকে বাঁচাতে পারবে, যাকে তুমি বাঁচাতে চাও, সে-ই জীবিত হয়ে উঠবে।" উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, "*শ্যামো য এষ রক্তাক্ষো বৃহচ্ছালঃ ইবোচ্ছ্রিতঃ। ব্যূঢ়োরস্কো মহাবাহুর্নকুলো যক্ষ! জীবতু।।*"[১৭] অর্থাৎ, শ্যাম বর্ণ ব্যক্তি, যার লাল চোখ, যিনি বিশাল শালবৃক্ষের ন্যায় বৃহৎ, যার দৃঢ়-বক্ষ ও শক্তিশালী বাহু, হে যক্ষ! সেই নকুল জীবিত হোক। যুধিষ্ঠিরের এই উত্তরে যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন, "*প্রিয়স্তে ভীমসেনোঽয়মর্জ্জুনো বঃ পরায়ণম্। স কস্মান্নকুলং রাজন্! সাপত্নং জীবমিচ্ছসি।।*" [১৮] অর্থাৎ, ভীমসেন

---

[১১] "মাতৃবত্ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবত্; আত্মবত্ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি, স পণ্ডিতঃ।।"— হিতোপদেশ, মিত্রলাভ —১৪ নং শ্লোক।

[১২] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৬৯, পৃষ্ঠা-২৫৬৮।

[১৩] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৭০, পৃষ্ঠা-২৫৬৮।

[১৪] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৪৭, পৃষ্ঠা-২৫৬০।

[১৫] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৪৮ন, পৃষ্ঠা-২৫৬০।

[১৬] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৮৯, পৃষ্ঠা-২৫৭৭।

[১৭] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৯০, পৃষ্ঠা-২৫৭৭।

[১৮] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৯১, পৃষ্ঠা-২৫৭৭।

তোমার প্রীতিভাজন, অর্জুন তোমার অবলম্বন, হে রাজন! তাহলে কেন সৎ-ভাই নকুলকে তুমি বাঁচাতে চাও? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, "*ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। তস্মাদ্ধর্ম্মং ন ত্যজামি মা নো ধর্ম্মো হতো বধীৎ।।*"[১৯] অর্থাৎ, ধর্মকে যে ব্যক্তি নষ্ট বা ত্যাগ করে, ধর্মই তাকে ধ্বংস করে। আর যে ব্যক্তি ধর্মকে রক্ষা করে, ধর্মই তাকে রক্ষা করে। সুতরাং আমি ধর্মকে ত্যাগ করি না; ধর্মকে যদি বিনষ্ট করি, তবে সে আমাকেই ধ্বংস করবে। তিনি আরও বলেন, "*কুন্তী চ যক্ষ মাদ্রী চ ভার্য্যে চৈতে পিতুর্মম। উভে সপুত্রে স্যাতাং বৈ ইতি মে ধীয়তে মতিঃ।।*"[২০] অর্থাৎ, হে যক্ষ! কুন্তী ও মাদ্রী—এই দুইজনই আমার পিতার পত্নী। তাদের উভয়েরই সন্তান থাকা উচিত—এটাই আমার মত। তিনি আরও বলেন, "*যথা কুন্তী তথা মাদ্রী বিশেষো নাস্তি মে তয়োঃ। মাতৃভ্যাং সমমিচ্ছামি নকুলো যক্ষ জীবতু।।*"[২১] অর্থাৎ, কুন্তী এবং মাদ্রীর মধ্যে আমার কাছে কোনো পার্থক্য নেই। আমি দুই মাতাকেই সমানভাবে দেখতে চাই। অতএব, হে যক্ষ! নকুলই জীবিত হোক। এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যুধিষ্ঠির কঠিন পরিস্থিতিতেও ধর্ম ত্যাগ করেন নি। ধর্ম রক্ষা করাকেই তিনি শ্রেয় বলে মনে করেছেন। এর থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, তিনি ধর্মের প্রকৃত ধারক ও বাহক। তিনি তাঁর নামের প্রকৃত পরিচয় দিয়েছেন।

উপসংহার:

মানুষ কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা যা কিছু করে বা অনুভব করে, সেই সমস্ত ক্রিয়াই তার অন্তঃকরণে সূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাবই সংস্কার নামে পরিচিত। সংস্কার বা গুণবিশেষ মানবচিত্তে এক প্রকার বীজরূপে স্থিত থাকে, যা পরবর্তীকালে কর্মফল হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই কর্মফলই মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের নির্ধারক।

জগতে যে বৈষম্য, পার্থক্য ও ভিন্নতা আমরা প্রত্যক্ষ করি— যেমন কেউ রাজা, কেউ ভিখারি; কেউ সুখভোগী, কেউ দুঃখক্লিষ্ট— তার অন্তর্নিহিত মূল কারণ একমাত্র ধর্ম ও অধর্ম। মানুষের ভাগ্য বা জীবনের অবস্থা কোনো দৈবসংঘটন নয়, বরং পূর্বকৃত কর্মের প্রতিফলন।

যে যেরূপ ধর্মাচরণ করে, সে সেইরূপ ফল ভোগ করে— এই নীতি চিরন্তন ও অব্যর্থ। ধর্মাচরণের ফল শুভ, শান্তি ও উন্নতির দিকে পরিচালিত করে; আর অধর্মাচরণের ফল দুঃখ, ক্লেশ ও অবনতির দিকে ঠেলে দেয়। ফলে এই জগতে কারো উচ্চ অবস্থান ও কারো নিম্ন অবস্থা আসলে ধর্মের কারণেই নির্ধারিত।

মহাভারতের লোমশ মুনি বলেছেন, *"বর্ধত্যধর্মেণ নরস্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি। ততঃ সপত্নাজ্জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।।"* [২২] অর্থাৎ মানুষ প্রথমে অধর্মে উন্নতি লাভ করে বলেই মনে হয়, কিন্তু শেষপর্যন্ত অধর্মই তার বিনাশ ঘটায়। তাই অর্থ বা ভোগের আশায় ধর্ম ত্যাগ কখনোই সমীচীন নয়, কারণ ধর্মহীন অর্জন অনিত্য— *"যেঽর্থা ধর্মেণ তে সত্যা যেঽধর্মেণ ধিগস্তু তান্ । ধর্মং বৈ শাশ্বতং লোকে ন জহ্যাদ্ধনকাঙ্ক্ষয়া ॥"* [২৩]

ধর্মের প্রকৃত ধারক সেই, যিনি নিজের স্বার্থবোধকে অতিক্রম করে সমষ্টির মঙ্গলের চিন্তা করেন। কারণ ধর্ম কোনো একরৈখিক পথ নয়— *"বহুদ্বারস্য ধর্মস্য নেহাস্তি নিষ্ফলা ক্রিয়া"* [২৪] — ধর্মের বহু দ্বার, বহু রূপ। অহিংসা, সত্য, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, ক্রোধবর্জন—এসবই ধর্মের লক্ষণ। এইগুলি এক ধরণের নৈতিক গুণাবলি। এগুলি সব যুগেই অপরিহার্য। এই কারণেই প্রতিটি আশ্রমের জন্য পৃথক ধর্ম নির্দিষ্ট হয়েছে, যাতে জীবনের প্রতিটি স্তরে মানুষ তার আত্মগুণের বিকাশ ঘটাতে পারে।

---

[১৯] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৯২, পৃষ্ঠা-২৫৭৮।

[২০] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৯৩, পৃষ্ঠা-২৫৭৮।

[২১] সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), মহাভারতের বনপর্বের আরণ্যক উপপর্ব, ২৬৭/৯৪, পৃষ্ঠা-২৫৭৮।

[২২] *মহাভারতম্* (২য় খণ্ড) নীলকণ্ঠী ভাষ্য সহ, পন্ডিত রামচন্দ্র শাস্ত্রী (সম্পা) বনপর্ব- ৯৪/৪, পৃষ্ঠা-১৫৬।

[২৩] *মহাভারতম্* (৫ম খণ্ড) নীলকণ্ঠী ভাষ্য সহ, পন্ডিত রামচন্দ্র শাস্ত্রী (সম্পা) শান্তিপর্ব ২৯২/১৯, পৃষ্ঠা-৪৮১।

[২৪] *মহাভারতম্* (৫ম খণ্ড) নীলকণ্ঠী ভাষ্য সহ, পন্ডিত রামচন্দ্র শাস্ত্রী (সম্পা) শান্তিপর্ব-৩৫২/২, পৃষ্ঠা-৭৪৪।

গ্রন্থপঞ্জি:

বাংলা গ্রন্থ:

১. সিংহ, কালীপ্রসন্ন (অনুদিত)। (২০১৪), বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত। কলকাতা: প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য তীর্থ।

২. সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ)। (১৪০০), মহাভারত, বনপর্ব। কলকাতা: (খণ্ড ৬-১১), বিশ্ববাণী প্রকাশনী।

৩. বন্দোপাধ্যায়, মানবেন্দু (সম্পাদিত)। মনুসংহিতা (কুল্লুকভট্টটীকা সহিত)। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

৪. সেন, অতুলচন্দ্র, তত্ত্বভূষণ, সীতানাথ ও ঘোষ, মহেশচন্দ্র (অনুবাদ ও সম্পা.)। ২০২১, উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ), কলকাতা: হরফ প্রকাশনী।

৫. বৈশেষিকসূত্র (মহর্ষি কণাদ)। প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ, (২০০৪), কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

৬. মীমাংসাসূত্র (জৈমিনি)। ভূতনাথ সপ্ততীর্থ কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ, (২০০৬), কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো।

৭. মানমেয়োদয় (নারায়ণভট্ট)। শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ (প্রথম খণ্ড), (১৯৯০), কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ।

৮. মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ। ১৪২১ (সপ্তম মুদ্রণ), নীতি, যুক্তি ও ধর্ম: কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি।

৯. মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ। ভারতীয় মহাকাব্যে ধর্ম, নীতি ও যুক্তি। ২০২৪ কলকাতা: অনুষ্টুপ প্রকাশনী।

১০. ব্রহ্ম, নলিনীকান্ত (সম্পাদিত)। শ্রীমদ্ভগবদগীতা (মধুসূদন সরস্বতী টীকা সহিত)। নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ।

১১. চক্রবর্তী, বিষ্ণুপদ। (১৯৯২), মহাভারত। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

১২. চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ সাংখ্যতীর্থ (রচনা ও সম্পা.)। ২০১৩, রামায়ণ-মহাভারত অবলম্বনে: মহাকাব্য নিবন্ধাবলী। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

১৩. মহাভারতম্ (১ম - ৭ম খণ্ড) নীলকণ্ঠী ভাষ্য সহ, পন্ডিত রামচন্দ্র শাস্ত্রী (সম্পা.), দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৯, পুনে: চিত্রশালা প্রেস।

১৪. মুখোপাধ্যায়, গুরুশঙ্কর (অনুবাদক), লৌগাক্ষিভাস্করকৃত অর্থসংগ্রহ: ব্যাখ্যামূলক বাংলা অনুবাদ। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো।

১৫. চক্রবর্তী, ড. সত্যনারায়ণ (সম্পাদক)। (১৯৯৮), হিতোপদেশ। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ।

ইংরাজী গ্রন্থ:

1. Iyer, K. Balasubramania. 1989. Yaksha Prasna. Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan.
2. Tarkatirtha, Ramendra Chandra. 1974. Mahabharata: Laksa-sloka-Rahasyam. Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay.
3. Rajagopalachari, C. 2024, Mahabharata. Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan.
4. Srinivasan, A. V. 2014, Yaksha Prashna: A Fable from the Mahabharata. New Delhi: Vision Books Pvt. Ltd.
5. Swami Sivayogananda. 2024, Yaksha Prashna: Dialogue between Yudhishthira and Lord of Dharma A Life Transforming Guide from Mahabharata. Mumbai Chinmaya Prakasana.